বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধে শরণার্থী সমস্যা ও ভারত

আশফাক হোসেন*

সার-সংক্ষেপ: বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারতের ভূমিকা প্রসঙ্গে বিভিন্নভাবে বহুবিধ আলোচনা হয়েছে এবং বিচ্ছিন্নভাবে শরণার্থী প্রসঙ্গটিও এসেছে। কিন্তু শরণার্থী ইস্যু নিয়ে ভারতের সামগ্রিক ভূমিকা বিশেষ করে আন্তর্জাতিক সমাজ ও জাতিসংঘে দেশটির ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার বিষয়টি প্রায় অনুল্লেখিত — এ কথা বলা যায়। বর্তমান প্রবন্ধে তথ্য ও পরিসংখ্যান বিশ্লেষণ করে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের এই অবহেলিত অথচ গুরুত্বপূর্ণ দিকটি বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রধান সমর্থক ভারত সূচনা থেকেই শরনার্থীদের উদারভাবে আশ্রয় দিয়েছে। ২৫ মার্চের মধ্যরাতের গণহত্যার অব্যবহিত পরে যে জনস্রোত ভারতীয় সীমান্তের দিকে ধাবিত হতে থাকে তাদের জন্য সবকটি সীমান্তাঞ্চল উন্মুক্ত করে দেয়া হয়। মে মাসে শরণার্থীদের সংখ্যা ছিল প্রায় ৩৫ লাখ এবং ১৫ ডিসেম্বরে তা বেড়ে দাড়ায় ৯৮ লাখ ৯৯ হাজার ৩০৫ জনে।

বর্তমান প্রবন্ধে মূলত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের জবাব অনুসন্ধান করা হয়েছে। প্রথমত, শরণার্থী নিয়ে ভারত সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগ যেমন শিবির স্থাপন, কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপ, ভারত কর্তৃক শরণার্থীদের পেছনে ব্যয়, বাজেটে করারোপ এবং জাতিসংঘ ও আন্তর্জাতিক সাহায্য গ্রহণের বিষয়টি আলোচিত হয়েছে। দ্বিতীয়ত, ভারতীয় সেনাবাহিনীর সম্পৃক্তি এবং হস্তক্ষেপের পটভূমির প্রতি দৃষ্টিপাত করা হয়েছে। ফলে স্বীকৃতি প্রশ্ন এবং শরনার্থী নিয়ে ভারতের কৌশলগত অবস্থানও আলোচনায় এসেছে। তৃতীয়ত, ভারতে শরনার্থীদের অবস্থা সম্পর্কে ভারতীয় ও আন্তর্জাতিক পত্রপত্রিকাসমূহে প্রকাশিত সংবাদসমূহের বিবরণ ও বিশ্লেষণ তুলে ধরা হয়েছে। একই সমান্তরালে শরণার্থী ও বাংলাদেশ প্রশ্নে ভারতীয় পার্লামেন্টের ভূমিকা আলোচিত হয়েছে। চতুর্থত, শরণার্থী প্রসঙ্গটি ভারত কীভাবে জাতিসংঘে উত্থাপন করেছে তার একটি নাতিদীর্ঘ বিশ্লেষণ করা হয়েছে। দেখা যাচ্ছে যে, ভারতের অনেক রাজনৈতিক নেতা ও আমলা কাশ্মির, পাঞ্জাব ও পূর্ব ভারতের নিরাপত্তা প্রশ্নে উদ্বিগ্ন ছিলেন। একই যুক্তিতে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ সমর্থনে তারা দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন। কিন্তু শরণার্থী সমস্যার ক্রমাগত চাপের জন্য ভারত বাংলাদেশ প্রশ্নে প্রত্যক্ষভাবে জড়িয়ে পড়ে। প্রখর রাজনৈতিক প্রজ্ঞা এবং দূরদৃষ্টির কারণে ইন্দিরা গান্ধী রাজনৈতিক সমীকরণের সঠিক হিসাব করেন এবং বাংলাদেশ প্রশ্নে তিনি ছিলেন স্থিরচিত্ত। তদুপরি সমস্যাটি স্থায়ী হলে ভারতের অর্থনীতি যে ভেঙ্গে পড়তো তা ইন্দিরা গান্ধী গভীরভাবে উপলব্ধি করেছিলেন।

বাংলাদেশ প্রশ্নে হস্তক্ষেপ করার জন্য আইনগত যুক্তি নির্মাণের ক্ষেত্রে ইন্দিরা গান্ধী শরণার্থী ইস্যুকে অত্যন্ত কুশলতার সাথে কাজে লাগিয়েছেন। ফলে শরণার্থী খাতে ব্যয় মেটানোর জন্য জাতিসংঘ, বিভিন্ন দাতা দেশ ও গোষ্ঠীর সহায়তার বিষয়টি ভারত সরকার বিবেচনা করে। তবে ভারতের কাছে শরণার্থী প্রশ্নটি ছিল বাংলাদেশকে সর্বোতভাবে সহায়তার একটি সহজ উপায়। আবার শরণার্থী সমস্যাই বাংলাদেশ আন্দোলনকে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছে বাঁচিয়ে রাখে। মার্চ-এপ্রিলের গণহত্যা সম্পর্কে বহির্বিশ্বের নিন্দাবাদ একটা সময় দুর্বল হয়ে যেত। কারণ চীন,

---

* প্রভাষক, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

মুসলিম রাষ্ট্রগুলো এবং যুক্তরাষ্ট্রের নিক্সন-কিসিঞ্জার জুটির সহায়তায় পাকিস্তান এই বিরাট সমস্যাকে নিজের অভ্যন্তরীণ সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করতে চাইতো। বাংলাদেশ সমস্যা যে সে পথে গেল না তার একটা বড় কারণ ছিল এই শরণার্থী। ভারতীয় ও বিদেশী সংবাদপত্রে শরণার্থীদের যে চিত্র ফুটে ওঠে তা দেখিয়ে ভারত অত্যন্ত কুশলতার সাথে বাংলাদেশ সমস্যাকে আন্তর্জাতিক সমাজের কাছে উপস্থাপন করে। কুটনৈতিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সমস্যা যত দুর্বল হতে থাকলো শরণার্থীদের অমানবিক চিত্র ততই প্রবল হলো। তখন জাতিসংঘ শরণার্থী সংস্থাসহ (UNHCR) অন্যান্য আন্তর্জাতিক মানবিক সংগঠনগুলোর নীরব থাকার কোন পথ খোলা ছিল না। এই চাপের মুখে ইয়াহিয়া খান দু'বার "সাধারণ ক্ষমা" ঘোষণা করলেও তাতে কোন আন্তরিকতা ছিল না। অন্যদিকে প্রাণভয়ে ভারতে আশ্রয় নেয়া বাঙালি শরণার্থীরা কোন অবস্থাতেই পাকিস্তানি রাষ্ট্র কাঠামো অপরিবর্তণীয় রেখে স্বদেশ প্রত্যাবর্তনে রাজি ছিলেন না। আর এভাবেই শরণার্থী প্রশ্নে ভারতের হস্তক্ষেপের পথ উন্মুক্ত হয়ে যায়।

শরণার্থীদের জন্য ভারত কিছু আন্তর্জাতিক সাহায্যও পেয়েছে। তবে প্রয়োজনের নিরিখে তা পর্যাপ্ত ছিলনা। বর্তমান প্রবন্ধে যে হিসাব দেয়া হয়েছে তাতে দেখা যায় যে, ভারত তার নিজস্ব তহবিল থেকেই শরণার্থীদের অধিকাংশ ব্যয় নির্বাহ করছে।

ভূমিকা

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারতের ভূমিকা প্রসঙ্গে, বিভিন্নভাবে বহুবিধ আলোচনা হয়েছে। এসব আলোচনায় বিচ্ছিন্নভাবে শরণার্থী প্রসঙ্গও এসেছে। তবে শরণার্থী ইস্যু নিয়ে ভারতের সামগ্রিক ভূমিকা বিশেষ করে আর্ন্তজাতিক সমাজ ও জাতিসংঘে দেশটির ক্রিয়া প্রতিক্রয়ার বিষয়টি প্রায় অনুল্লেখিত থেকেছে। বর্তমান প্রবন্ধে তথ্য ও পরিসংখ্যান বিশ্লেষণ করে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের এই অবহেলিত ও অনালোচিত অধ্যায় উন্মোচনের চেষ্টা করা হয়েছে এবং এর ভিত্তিতে একটি উপসংহারে পৌছানোর প্রয়াস পাওয়া গেছে।

সূচনা থেকেই বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রধান সমর্থক ভারত শরণার্থীদের উদারভাবে আশ্রয় দিয়েছে। ২৫ মার্চের মধ্যরাতের গণহত্যার অব্যবহিত পরে যে জনস্রোত ভারতীয় সীমান্তের দিকে ধাবিত হতে থাকে তাদের জন্য সবকটি সীমান্তাঞ্চল উন্মুক্ত করে দেয়া হয়। মৃত্যুর গহবর থেকে পালিয়ে যাওয়া এই মানুষগুলো শরণার্থী হিসেবে ভারতের মাটিতে আশ্রয় নেয়। মে মাসে এদের সংখ্যা ছিল প্রায় ৩৫ লাখ এবং ১৫ ডিসেম্বর তা বেড়ে দাঁড়ায় ৯৮ লাখ ৯৯ হাজার ৩০৫ জনে।[১]

অবরুদ্ধ বাংলাদেশ থেকে বাস্তুচ্যুত এ জনগোষ্ঠীকে আর্ন্তজাতিক মিডিয়া, বিভিন্ন দেশ ও জাতিসংঘ শরণার্থী হিসেবে অবহিত করে। প্রায় ১ কোটি শরণার্থীদের মধ্যে তেমন কোন বিভাজন ছিল না। উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত

নির্বিশেষে নামহীন শরণার্থীরা বিভিন্ন শিবিরে অবস্থান করেছেন। তৎকালীন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক গোলাম মুরশিদ লিখেছেন, "কেবল নিজেদের সহায় সম্পত্তি নয়, জীবনের ঝুঁকি নিয়েই সবাইকে হতে হয়েছিল শরণার্থী। সেই এক কোটি শরণার্থীর ভিড়ে আমিও সেদিন মিশে গিয়েছিলাম। কিন্তু জীবন ছাড়া প্রায় সবই আমাকে ত্যাগ করতে হয়েছিল।"[২]

প্রশ্ন হলো যে, জীবন ছাড়া সবকিছু ত্যাগী এ জনগোষ্ঠীকে আর্ন্তজাতিক রীতিনীতি ও আইনের পরিভাষায় কী বলা যায়। অবশ্যই শরণার্থী। জাতিসংঘে শরণার্থী সংস্থা (UNCHR)-এর ১৯৫১ সালের সংবিধি অনুযায়ী ভারতে আশ্রয় নেয়া বাঙালি জনগোষ্ঠীকে শরণার্থী হিসেবে অভিহিত করা যায়। সাম্প্রতিক সংজ্ঞার আলোকে এরা শরণার্থীই ছিলেন।[৩] দেখা যাচ্ছে যে, জাতিসংঘ শরণার্থী সংস্থা সে সময় উপমহাদেশে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর বৃহত্তম ত্রাণ কার্যক্রমটি পরিচালনা করে।

বর্তমান প্রবন্ধে মূলত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের জবাব অনুসন্ধান করা হবে। প্রথমত, শরণার্থী নিয়ে ভারত সরকারের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া যেমন শিবির স্থাপন, কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপ, ভারত কর্তৃক শরণার্থীদের পেছনে ব্যয়, বাজেটে করারোপ এবং জাতিসংঘ ও আন্তর্জাতিক সাহায্য গ্রহণের বিষয়টি আলোচিত হয়েছে। দ্বিতীয়ত, ভারতীয় সেনাবাহিনীর সম্পৃক্তি এবং হস্তক্ষেপের পটভূমির প্রতি দৃষ্টিপাত করা হয়েছে। ফলে স্বীকৃতি প্রসঙ্গ ও শরণার্থী নিয়ে ভারতের কৌশলগত অবস্থানও আলোচনায় এসেছে। বস্তুত শরণার্থীদের কারণেই বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ আন্তজাতিক রূপ নেয় এবং ভারত যে এই যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছিলো সে সুযোগও করে দিয়েছিলো এই শরণার্থীরা। তৃতীয়ত, শরণার্থীদের অবস্থা সম্পর্কে ভারতীয় ও আন্তর্জাতিক পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদসমূহের বিবরণ ও বিশ্লেষণ তুলে ধরা হয়েছে। একই সমান্তরালে শরণার্থী ও বাংলাদেশ প্রশ্নে ভারতীয় পার্লামেন্টের ভূমিকাও আলোচিত হয়েছে। সবশেষে ভারত শরণার্থী ইস্যুটি জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থা ও কমিটিতে কীভাবে উত্থাপন করেছে তার বিবরণ রয়েছে। ভারত মানবিক বিষয় অর্থাৎ শরণার্থী ইস্যুকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে জাতিসংঘে উত্থাপন করেছে এবং রাজনৈতিক প্রশ্নে সবসময়ই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতার কথাই বলেছে।

ভারত সরকারের প্রতিক্রিয়া এবং শরণার্থীদের পেছনে বর্হিবিশ্ব ও ভারতের ব্যয়

ভারত অত্যন্ত সতর্কতার সাথে পূর্ব বাংলার ঘটনা প্রবাহ পর্যবেক্ষণ করে। ২৫ মার্চে অপারেশন 'সার্চলাইটের' মাধ্যমে পূর্ববাংলায় যে নজিরবিহীন গণহত্যা হয় তার বিরুদ্ধে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ২৭ মার্চ ভারতীয় পার্লামেন্টে তীব্র নিন্দা জানান।[৪] শরণার্থীদের অবিশ্বাস্য হারে ভারতে প্রবেশ করায় মানবিক কারণেই ভারতের পিছিয়ে আসার কোন পথ খোলা ছিল না। ভারতের সামনে তখন দুটো প্রধান লক্ষ্য ছিল। প্রথমত, মানবিক কারণ এবং দ্বিতীয়ত, জাতীয় স্বার্থ। ইন্দিরা গান্ধীর জীবন আলেখ্যের রচয়িতা ভারতীয় গবেষক Inder Malhotra লিখেছেন, "Humanitarian feelings were the main motivating force behind this outcry. But many Indians also saw in the heart rending situation an opportunity to cut Pakistan down to size.[৫] অন্যদিকে ভারতের সমরকৌশলের প্রণেতারা জাতীয় স্বার্থের বিষয়টিকেই বড় করে দেখেছেন। ৩১ মার্চ নয়া দিল্লীতে এক সেমিনারে The Institution for Defense Studies and Analysis (IDSA) এর পরিচালক কে. সুব্রামানিয়াম বলেন, "What India must realise is that the break up of Pakistan is in our interest, the like of which will never come again." ঐ সেমিনারে অংশগ্রহণকারী প্রায় সকলেই সুব্রামানিয়ামের বক্তব্যের সাথে সহমত পোষণ করেন এবং তারা বলেন যে, চলতি শতকে ভারত তার 'এক নম্বর শত্রু' পাকিস্তানকে 'ধ্বংস' করতে চমৎকার সুযোগ পেয়েছে।[৬] আবার ভারতের কিছু বামপন্থী রাজনীতিবিদ ও বুদ্ধিজীবী মনে করেন যে, ইন্দিরা গান্ধী ক্রমবর্ধমান নকশাল আন্দোলনকে দমন করার জন্যে বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের দায় নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন।[৭]

ভারতীয় রণকৌশলের প্রণেতা, বামপন্থী রাজনীতিবিদ ও বুদ্ধিজীবীদের স্বীকারোক্তিতে জাতীয় স্বার্থের বিষয়টি স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। তবে মানবিক কারণ যে অন্যতম প্রধান কারণ ছিল তা কোনভাবে অস্বীকার করা যায় না। বস্তুত ভারত প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত শরণার্থীদের উদারভাবে সাহায্য করে।[৮] এজন্যে ভারত শরণার্থীদের সাহায্যে এগিয়ে আসে এবং দ্রুত বিষয়টি আর্ন্তজাতিক পর্যায়ে উত্থাপন করে। জাতিসংঘে নিযুক্ত ভারতের স্থায়ী প্রতিনিধি সমরসেন নির্লিপ্ত জাতিসংঘের সমালোচনা করে মার্চের অন্তিম দিনে একটি বার্তা মহাসচিবের কাছে হস্তান্তর করেন। ঐ বার্তায় বলা হয়, "বাংলাদেশে পশ্চিম পাকিস্তানী [পাকিস্তানি] সৈন্যদের নির্যাতন এমন এক পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে যে, তা

পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার মনে করে চুপচাপ থাকার সময় আর নেই। মানব দুর্গতির এ মুহূর্তে জাতিসংঘের নিষ্ক্রিয়তা ও নীরবতাকে দুর্গত জনগণ বর্হিবিশ্বের উদাসীনতা হিসেবে মনে করবে।"[৯]

ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার ও পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্য সরকারগুলো এ দুর্গত জনগণের প্রতি কোনরূপ উদাসীনতা দেখায় নি। বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ঐতিহাসিক ও নৃতাত্ত্বিক বন্ধনের কারণে শরণার্থীদের প্রতি ব্যাপক সাহায্য ও সহানুভূতি প্রদর্শন করে। যেমন- পশ্চিমবঙ্গ সরকার ২২ এপ্রিল এক জরুরি বৈঠকে মিলিত হয়ে শরণার্থীদের সাহায্যের জন্যে আবেদন জানায়।[১০] ঐদিন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী আর, কে, খাদিলকর পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারকে জানান যে, কেন্দ্রীয় সরকার ত্রাণ তৎপরতার সমুদয় ব্যয় বহন করবে।[১১] ৫ মে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল শ্রী ধাওয়ান বিধান সভায় বলেন যে, বাংলাদেশ থেকে আগত শরণার্থীদের আশ্রয় দেয়া পশ্চিমবঙ্গ ও ভারত সরকারের নীতি হবে।

৭ মে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী বাংলাদেশ নিয়ে আলোচনার জন্যে সকল বিরোধী দলের সাথে বৈঠকে বসেন। বৈঠকে স্বীকৃতি সমস্যা ও শরণার্থী বিষয়ে আলোচনা হয়। ঐ বৈঠকে সকলেই একমত হন যে, ত্রাণকার্য 'আর্ন্তজাতিক রূপ নিক।' বৈঠকে অর্থমন্ত্রী শ্রী চ্যাবন ইঙ্গিত দেন যে, ত্রাণকার্যে মোট ষাট কোটি টাকা প্রয়োজন।[১২]

৮ মে ভারতের পূর্বাঞ্চলীয় ৫ টি রাজ্যের মূখ্যমন্ত্রীগণ জাতির উদ্দেশ্যে এক বিবৃতিতে শরণার্থী সমস্যাকে ভারতের জাতীয় সমস্য হিসেবে চিহ্নত করার আবেদন জানান। তারা কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্দেশ্যে স্পষ্ট করে বলেন যে, এমন অবস্থা সৃষ্টি করতে হবে যাতে শরণার্থীরা বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন করতে পারে।[১৩]

পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলোর এই আহ্বানের পর প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ১৫ ও ১৬ মে পশ্চিমবঙ্গ, আসাম ও ত্রিপুরায় বেশ কিছু শরণার্থী শিবির পরিদর্শন করেন। ১৬ মে কলকাতার দমদম বিমানবন্দরে ভারতের খাদ্য সমস্যার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন যে, শরণার্থী সমস্যা একটি বিরাট সমস্যা এবং এটি মোকাবিলা করা একটি কঠিন কাজ।[১৪] ১৮ মে রানীক্ষেতে এক সমাবেশে ভাষণ দানকালে ইন্দিরা গান্ধী শরণার্থী সমস্যা অনুধাবনের জন্যে বৃহৎ শক্তিগুলোকে আহবান জানান এবং বলেন যে, "The burden is heavy on us, how can we ignore helpless refugees?"[১৫]

২০ মে ভারতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী জগজীবন রাম স্পষ্ট করে বলেন যে, "The Nations of world would have to consider what other step could be taken to solve the problem created by the 'unprecedented' influx of evacuees from Bangla Desh".[১৬] শরণার্থীদের আশ্রয়দান ও প্রত্যাবর্তন প্রশ্নে বহির্বিশ্বের দায়িত্বের বিষয়টি কোনভাবেই অস্বীকার করা যায় না। জাতিসংঘসহ বিভিন্ন রাষ্ট্র এ বিষয়ে এগিয়ে এসেছিল, যদিও প্রয়োজনের তুলনায় তা পর্যাপ্ত ছিল না। নিচের দু'টি সারণিতে এর একটি বিশ্লেষণ পাওয়া যাবে।

সারণি : ১

জাতিসংঘ ও আর্ন্তজাতিক সাহায্য

আর্ন্তজাতিক সাহায্য	জাতিসংঘের সাহায্য	মোট
১৬,৫০,০০,০০০ ডলার	৯,৮০,০০,০০০ ডলার	২৬,৩০,০০,০০০

উৎসঃ *UN Newsletter* (New York: Office of the Public Information, July 1971); *International Herald Tribune*, Paris, 8 July 1971.

সারণি: ২

শরণার্থীদের সাহায্যে বিভিন্ন দেশ

দেশ	অনুদান
যুক্তরাষ্ট্র	৭,০৫,০০,০০০ ডলার
ব্রিটেন	৭২,০০,০০০ ডলার
জাপান	৫০,০০,০০০ ডলার

সূত্র ঃ *Keesings Contemporary Achives*, p.24990.

অবশ্য যুক্তরাষ্ট্রের সাহায্যের পরিমাণ পরবর্তীকালে আরো বেড়ে গিয়েছিল। ভারতীয় লেখক Surjit Mansingh এর মতে, ১৯৭১-৭২ সালে শরণার্থী ও অন্যান্য খাতে যুক্তরাষ্ট্রে মোট ৯৪.৫ মিলিয়ন ডলার সাহায্য দেয়।[১৭] ১৯৭১ সালের জুলাই পর্যন্ত জাতিসংঘ ও অন্যান্য উৎস থেকে ভারত সরকারকে ২৬৩ মিলিয়ন ডলারের সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয় (সারণি-১ দ্রষ্টব্য)। পরবর্তী মাসগুলোতে জাতিসংঘ, বিশ্বব্যাংক, বিভিন্ন দেশ ও আর্ন্তজাতিক সংস্থা থেকে আরো সাহায্য ও প্রতিশ্রুতি আসে। যদিও প্রতিশ্রুত সাহায্যের সবটুকু পাওয়া যায়

নি। অন্যদিকে জাতিসংঘের প্রতিশ্রুত সাহায্যের একটি ক্ষুদ্র অংশ প্রথমে অবরুদ্ধ বাংলাদেশে, পরবর্তীকালে যুদ্ধ বিধ্বস্ত বাংলাদেশে পূণর্গঠন কাজে ব্যবহৃত হয়েছে। সুতরাং মোটামুটিভাবে বলা যায় যে, শরণার্থীদের পেছনে ভারত যে অর্থ ব্যয় করেছে তার বেশিরভাগই তাকে বহন করতে হয়েছে। এবং এজন্যে ১৯৭১ পরবর্তী কয়েক বছর জনগণকে কর প্রদান করতে হয়েছে।[১৮]

১৯৭১ পরবর্তী ভারতের অর্থনৈতিক সংকটের একটি কারণ ছিল এই শরণার্থী। শরণার্থীদের পেছনে অর্থ ব্যয় করে ভারতের অর্থনীতিতে সংকট সৃষ্টির জন্যে বিরোধী রাজনীতিবিদরা ইন্দিরা গান্ধীর কঠোর সমালোচনা করেন। অনেকের মতে, পরবর্তী লোকসভা নির্বাচনে ইন্দিরার পরাজয়ের এটি একটি অন্যতম প্রধান কারণ ছিল।[১৯]

ভারতীয় সেনাবাহিনীর সম্পৃক্তি এবং হস্তক্ষেপের পটভূমি

লেঃ জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরার মতে, শরণার্থী সমস্যায় ন্যুজ ভারত বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সাহায্য করতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। সরকারিভাবে মে মাসেই বিষয়টি ভারতের সামরিক বাহিনীর উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের জানিয়ে দেয়া হয়।[২০]

শুধু সামরিক বাহিনী নয়, প্রচার ফ্রন্টকে একইভাবে অবহিত করে ভারত সরকার। ১৭ জুন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী সংবাদপত্রের সাথে এক বৈঠকে শরণার্থী সমস্যা কীভাবে ভারতের জাতীয় স্বার্থ বিঘ্নিত করছে তার বিবরণ দেন। তিনি স্পষ্ট করে বলেন, "Each nation has to look after its own interest and what is happening in East Bengal is affecting our interest. It started as the internal problem of Pakistan but very soon it also became the internal problem of India." একই বৈঠকে ইন্দিরা গান্ধী বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন প্রশ্নে পাকিস্তানের মিত্রসহ বেশ কিছু রাষ্ট্রের বিরোধিতা ও বিভ্রান্তির বিশ্লেষণ দেন। তিনি বলেন যে, যে সব দেশে বিচ্ছন্নতার আন্দোলন চলছে তারা মনে করে যে, বাংলাদেশের বিষয়টিও একই রকম। কিন্তু, " The situation is quite different because it is not just a small part of the country that is asking for its rights. It happens to be the majority of the country, not a small part wanting to go away."[২১]

ভারত বাংলাদেশ প্রশ্নে শুধু মানবিক ও যৌক্তিক কারণগুলোই সামনে এনেছে তা নয়। ভারত চেয়েছিল শরণার্থী সমস্যাটি আর্ন্তজাতিকীকরণ হোক তাতে সুবিধা এই যে, তখন শরণার্থী প্রশ্নে পূর্ব বাংলায় হস্তক্ষেপের পথ উন্মুক্ত হবে। বিশেষত

বিপুল সংখ্যক শরণার্থীর আগমনে ভারতের অর্থনীতিতে যে প্রবল চাপ সৃষ্টি হয়েছিল, ভারত সেই চিত্রকে তার আত্মরক্ষার যুক্তি (Self Defense) হিসেবে উত্থাপন করে। *Newsweek*-এর দৃষ্টিতে, "ভারতীয়দের মতে, বাংলাদেশ স্বাধীন হলে লোকসানের চেয়ে লাভের পরিমাণ হবে অনেক বেশী। প্রথমত শরণার্থী সমস্যার সমাধান হবে। সবচেয়ে বড় কথা পাকিস্তানের ভাঙ্গনের ফলে উপমহাদেশে ভারতের প্রভাব প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাবে। বিশেষ করে মিসেস গান্ধী এন্ড কোং এর উদ্দেশ্য এশিয়ায় পিকিং এর প্রবল প্রভাব ক্ষুন্ন করা সম্ভব হবে।"[২২] ভারত কীভাবে হস্তক্ষেপের পটভূমি রচনা করে এর একটি স্পষ্ট বিশ্লেষণ পাওয়া যায় ব্রিটেনের *Financial Times*-এ। পত্রিকাটির সম্পাদকীয়তে বলা হয় যে, "পূর্বাঞ্চলে তার (ইয়াহিয়ার) নীতি হঠকারীতারপূর্ণ আহম্মকীতে ভরা এবং বাঙ্গালি জনগণকে দমন করার জন্যে বর্বরও বটে। তবে মিসেস গান্ধীর সরকার বাংলাদেশে ইয়াহিয়ার নীতিকে সূচারুরূপে কাজে লাগিয়েছে যাতে যুদ্ধ বাঁধে। দিল্লী শরণার্থীদের ব্যবহার করছে অংশত যুদ্ধের অজুহাত স্বরূপ, অংশত ভারতীয় সৈন্যের পূর্ব পাকিস্তান আক্রমন করার আবরণ স্বরূপ।"[২৩]

অবশ্য ভারতের হস্তক্ষেপ ব্যতীত বিকল্প কোন পথ খোলা ছিল না। ভারতীয় জেনারেল এবং গবেষকদের ভাষ্য হলো, "refugee problem were threatening India`s security and its very existance."[২৪] ভারত যুক্তি দেখায় যে, পাকিস্তান তার বেসামরিক নাগরিকদের ভারতে ঠেলে দিয়ে ভারতীয় অর্থনীতিতে মারাত্মক চাপ সৃস্টি করেছে। ভারত তাই এই 'সিভিল আগ্রাসনের' পাল্টা ব্যবস্থা হিসেবে প্রতি আক্রমণের হুমকি দেয়। আর্ন্তজাতিক আইনে এটি Self Defense বা আত্মরক্ষার্থে প্রতি আক্রমণ বলে পরিচিত।[২৫]

স্বীকৃতি প্রশ্ন ও শরণার্থী সমস্যা

বাংলাদেশ প্রশ্নে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ভারতের সরকারি মনোভাব ছিল খুবই সতর্ক। বিশেষ করে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী জনপ্রিয় দাবি ও বিরোধী দলীয় চাপের কাছে নতি স্বীকার না করে স্বীয় পরিকল্পনা অনুযায়ী অগ্রসর হন।

মে মাসের শুরু থেকে ভারত জুড়ে বাংলাদেশকে অবিলম্বে স্বীকৃতি দানের দাবী ওঠে। ভারতের বুদ্ধিজীবীদের সংগঠন "বাংলাদেশ জাতীয় সমন্বয় কমিটি" ৫ মে ভারতে 'বাংলাদেশ স্বীকৃতি দিবস' পালনের ডাক দেয়। ঐ দিন বিকেলে কলকাতা শহীদ মিনারে পশ্চিমবঙ্গের বুদ্ধিজীবী, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, কবি,

সাংস্কৃতিক কর্মী ইত্যাদি নানা পেশার লোক এক সভায় মিলিত হয়ে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদানের আহবান জানান। সভায় সভাপতিত্ব করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ভাইস চ্যান্সেলর ডঃ রমেশ চন্দ্র মজুমদার। ঐ সভায় অধ্যাপক হরিপদ ভারতী বলেন, "এতদিন ভারত সরকার বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রশ্নে নীরব থেকে প্রকারন্তরে পাকিস্তানের জংগী শাহীকে সমর্থন জানাচ্ছে।"[২৮]

ভারতের বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের পত্রপত্রিকা, রাজনৈতিক দল তথা সর্বস্তরের জনগণ শরণার্থীদের সাহায্য দান এবং বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদানের জন্যে ভারত সরকারের কাছে জোর দাবি জানতে থাকে। যেমন- *আনন্দবাজর পত্রিকা* ৩ এপ্রিল, *যুগান্তর* ১৩ এপ্রিল বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদানের পক্ষে দীর্ঘ সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। এসব সম্পাদকীয়তে বলা হয় যে, বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়া হলে বর্তমান সংকট ভারত পাকিস্তান সংকটের পরিবর্তে বাংলাদেশ-পাকিস্তান সমস্যার রূপ নেবে এবং হতভাগ্য শরণার্থীদের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পথ সুগম হবে।

ভারতীয় লোকসভায় ১৮ জুন কর্নাটিকের সাংসদ শ্রী সমর গুহ বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানের প্রস্তাব উত্থাপন করেন। কিন্তু সরকারি দল কংগ্রেস এর বিরোধিতা করে।[২৭] এভাবে সারা ভারতে বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানের জন্যে যে ব্যাপক জনমত গড়ে ওঠেছিল তা ইন্দিরা সরকার ডিসেম্বরের চূড়ান্ত বিজয়ের আগ পর্যন্ত উপেক্ষা করে। মে মাসের মাঝামাঝি ইন্দিরা গান্ধী শরণার্থী সমস্যার প্রতি গুরুত্বারোপ করে বলেছিলেন যে, "No recognition at wrong time"[২৮]

সরকারি দৃষ্টিভঙ্গি বিশ্লেষণকালে দেখা যায় যে, জাতীয় স্বার্থের কারণে ভারত স্বীকৃতিদানের বিষয়টি বিভিন্ন দিক থেকে বিবেচনা করছিল। ভারত সরকারের তথ্য কর্মকর্তা বি এল শর্মা ৭ মে, ১৯৭১ সংবাদ পত্রে এক নিবন্ধে বলেন যে, ভারত সরকার পাকিস্তানের সাথে যুদ্ধের ঝুঁকি এড়িয়ে চলার জন্যে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিচ্ছে না। তিনি আর্ন্তজাতিক আইনের দৃষ্টিতে বিষয়টি পর্যালোচনা করে বলেন যে, ভারত বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিলে সেটি হবে ইজরাইলকে যুক্তরষ্টের স্বীকৃতি দেয়ার মত রাজনৈতিক স্বীকৃতি। তার বক্তব্য ছিল যে, বাংলাদেশের ক্ষেত্রে তখনও এ ধরনের রাজনৈতিক স্বীকৃতি দেয়া সম্ভব ছিল না। কারণ (১) যুদ্ধের সরাসরি সম্ভাবনা (২) এতে পাকিস্তান বিষয়টি নিরাপত্তা পরিষদে তুলতে চাইবে এবং কাশ্মীর প্রশ্নটি পুনরায় আলোচনায় চলে আসবে। পূর্ব অভিজ্ঞতা অনুযায়ী ভারত নিরাপত্তা পরিষদে তেমন কোন সমর্থন পাবে না। (৩) মুসলিম দেশগুলোর সহানুভূতি পাকিস্তানের সমর্থনের পক্ষে চলে যেত।[২৯]

অর্থাৎ আইনগত জটিলতা এবং আর্ন্তজাতিক রাজনীতির কারণে ভারত বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানের বিষয়টি বিলম্বিত করছিল। কিন্তু শরণার্থী প্রশ্নে সরকারের কোন উদাসীনতা ছিল না। যদিও ভারতের এলিট শ্রেণীর বিচিত্র মনোভাব ছিল। মুহাম্মদ আইয়ুব ও কে সুব্রামানিয়াম এ প্রসঙ্গে লিখেছেন যে, অনেকে যুক্তি দেখাতো যে, শরণার্থী পূর্নবাসনে ভারত বিদেশী সাহায্য পাবে এবং এই আন্তর্জাতিক সাহায্য থেকে অন্তত বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন সম্ভব হবে। আবার অনেকে ভারতের ক্রমবর্ধমান বেকার সমস্যার কথা ভুলে গিয়ে বলল 'কাজের জন্যে অতিরিক্ত শ্রমিক পাওয়া গেল'।[৩০]

অন্যদিকে ভারতের অবাঙালি অধ্যুষিত রাজ্যগুলোতে শরণার্থী ছড়িয়ে দেবার জন্যে ভারত সরকারের উদ্যোগও প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়। রাজস্থান ও মধ্যপ্রদেশের মত রাজ্যগুলো শরণার্থীদের গ্রহণে প্রথম দিকে অস্বীকৃতি জানায়।[৩১]

ভারতীয় পার্লামেন্টের ভূমিকা

বাংলাদেশ পরিস্থিতি বিশেষ করে শরণার্থী সমস্যা নিয়ে ভারতের পার্লামেন্টের উভয় কক্ষে (রাজ্যসভা ও লোকসভা) অসংখ্যবার আলোচনা হয়েছে। ৩১ মার্চ রাজ্যসভা ও লোকসভায় বাঙালিদের ন্যায়সঙ্গত স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি সমর্থন ঘোষণা করে বলা হয়: "The House records its profund conviction that the historic upsurge of the 75 million of people of East Bengal will triumph. The house wishes to assure them that their struggle and sacrifices will receive the whole hearted sympathy and support of the people of India."[৩২]

৭ মে স্বীকৃতি ও শরণার্থী প্রশ্নে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় সর্বসম্মতিক্রমে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। বাংলাদেশকে পূর্ণাঙ্গ স্বীকৃতি ও শরণার্থীদের সাহায্যদান বিষয়ে প্রস্তাব উত্থাপন করেন স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী শ্রী অজয় মুখার্জী এবং প্রস্তাবটি সমর্থন করেন বিরোধীদলীয় নেতা শ্রী জ্যোতিবসু।[৩৩]

শরণার্থী সমস্যা ও বাংলাদেশ সংকট নিয়ে ভারতীয় পার্লামেন্টে উভয় কক্ষে (লোকসভা ও রাজ্যসভা) অসংখ্যবার আলোচনা হয়েছে। নীচের পরিসংখ্যান থেকে আমরা এ বিষয়ে একটি অনুমান করতে পারি।

সারণি: ৩
বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও ভারতীয় পার্লামেন্ট

পার্লামেন্টর কক্ষ	মোট অধিবেশন	বাংলাদেশ প্রশ্নে বৈঠক	প্রশ্নাকারে উত্থাপিত
রাজ্যসভা	৮০	৬৭	২২২
লোকসভা	৯২	৭৩	২৯৬

সূত্র : ভারতের রাজ্যসভা ও লোকসভার কার্যবিবরণী বিশ্লেষণ করে প্রস্তুত করা হয়েছে।

ভারতীয় ও বিদেশী পত্রিকার দৃষ্টিতে শরণার্থী পরিস্থিতি

ভারতের শীর্ষস্থানীয় পত্রপত্রিকাসমূহ এবং বিদেশী পত্রিকায় প্রথম থেকেই শরণার্থীদের নানাবিধ সমস্যা ও দুঃখকষ্টের বিবরণ ওঠে এসেছে। ভারতীয় পত্রিকাগুলোর মধ্যে *যুগান্তর, আনন্দবাজার, Statesman, Amirta Bazar Patrika, Hindustan Standard, National Herald* ইত্যাদি ছিল উল্লেখযোগ্য। অন্যদিকে বিদেশী পত্রিকার মধ্যে ব্রিটেনের *The Economist, Sunday Times, সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রাভদা* এবং যুক্তরাষ্ট্রের *New York Times* অন্যতম।

প্রথমদিকে ভারতীয় পত্রিকাগুলোই এগিয়ে আসে। তারা শরণার্থী জীবনের অনিশ্চয়তা, অপ্রশস্থ ও মানবেতর শিবিরসমুহের করুণ কাহিনী তুলে ধরে। *যুগান্তর* ৩ এপ্রিল সংখ্যায় "এখান থেকে এরা কোন ভবিষ্যতে পাড়ি দিবে?" শিরোনামে এক রিপোর্টে জানায়, "ইছামতির তীরে সারি সারি নৌকার মধ্যে যারা রয়েছে তারা যে এরপর কোথায় পাড়ি দিবে জানে না। অন্য কেউ কি জানে?" শরণার্থী জীবনের অনিশ্চয়তার দিকটি মূলত এখানে তুলে ধরা হয়েছে।

ভারত সরকার অবশ্য এই শরণার্থীদের হানাদার অধ্যুষিত বাংলায় মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয় নি। তাদের জন্যে বিভিন্ন স্থানে রিলিফ ক্যাম্প স্থাপন করা হয়। *যুগান্তর*- এর একই রিপোর্টে দেখা যায় সরকারিভাবেই ক্যাম্প স্থাপিত হয়েছে এবং এসব ক্যাম্পে হিন্দু মুসলিম ও খৃষ্টান মিলে প্রায় সাতাশ হাজার শরণার্থী আশ্রয় নিয়েছে। এখানে মাথাপিছু বরাদ্দ ৪০০ গ্রাম চাল, ১০০ গ্রাম ডাল আর

১০০ গ্রাম আলু ও পেয়াঁজ। ছ'দিনের রেশন একসঙ্গে বিতরণ করে মাড়োয়ারী রিলিফ কমিটি।[৩৪]

Hindustan Standard ১২ এপ্রিল সংখ্যায় শরণার্থীদের উদ্ধৃতি দিয়ে পূর্ব বাংলায় গণহত্যার বিবরণ দেয়। হরিদাসপুর সীমান্তের চেকপোস্ট থেকে নারায়ন দাসের "Evacuees Narrate Army Atrocities" শিরোনামে প্রেরিত রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে, "A 60 year old man Harmat Ali Mondal of Jessore town also lost three of his sons, could not talk to me as he was weeping all the time. Some people was seen consoling him."[৩৫] পাকিস্তানি সৈন্যরা শুধু গণহত্যা চালিয়ে ক্ষান্ত হয় নি বরং যারা প্রাণভয়ে ভারতে যাচ্ছিল তাদেরকেও হত্যা করে।[৩৬]

যুগান্তর ৯ মে ১৯৭১ সংখ্যায় পূর্বাঞ্চলীয় বিভিন্ন রাজ্যে ও জেলায় শরণার্থীদের পরিসংখ্যান এবং শরণার্থী সমস্যা মোকাবিলায় ভারতের জনগণ ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ঐকান্তিক প্রচেষ্টার বিবরণ দেয়। শরণার্থীদের উদ্ধৃতি দিয়ে পত্রিকাটি লিখে, "এই বাংলায় আতিথিয়েতায় তারা মুগ্ধ, সামান্য ত্রুটিগুলি তারা ধরছেন না।" কিন্তু ক্রমশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছিল। কারণ শরণার্থীরা আসছিল স্রোতের মত। একই দিন *যুগান্তর*-এর অন্য একটি রিপোর্টে এই ইঙ্গিত পাওয়া যায়। কলকাতা থেকে বিশেষ প্রতিনিধির প্রেরিত "শরণার্থী আগমন অব্যাহত ঃ সমস্যা বাড়ছে", শিরোনামে প্রকাশিত রিপোর্টে জানা যায় যে, "কোচবিহার জেলার ছোট শহর হলদিবাড়িতে এ পর্যন্ত দেড় লক্ষের বেশি শরণার্থী এসেছেন। বিভিন্ন বিদ্যালয় ভবন কিংবা খালি বাড়িতে প্রথমদিকে এদের স্থান দেয়া হয়েছিল, এখন তাও পাওয়া যাচ্ছে না। বহু শরণার্থীকে আকাশের তলায় রাত কাটাতে হচ্ছে। এই অসহনীয় অবস্থার প্রতিকারের জন্যে জেলা কর্তৃপক্ষ রাজ্য সরকারের কাছ থেকে তাবু ও ঔষধপত্র চেয়েছেন।" একই সংখ্যায় অন্য আরেকটি রিপোর্টে *যুগান্তর* জানায় যে, ত্রিপুরায় শরণার্থীর সংখ্যা চার লাখ।[৩৭] *Statesman* ২৩ মে ১৯৭১ সংখ্যায় ত্রিপুরায় সীমান্তবর্তী শহর সাব্রুমের পরিস্থিতি তুলে ধরে। মনোজিৎ মিত্রের (Manojit Mitra) এর পাঠানো রিপোর্টে বলা হয়, "Sabroom was the most worst crowded border of Tripura in the third and fourth weeks of April when newly 2,00,000 refugees arrived within a few days... Thousands of people were living in the streets. Many people looked for food, but not all of them had the money to buy it. There was an acute shortage of drinking water."

ভারতীয় পত্রপত্রিকার রিপোর্টগুলি থেকে শরণার্থী পরিস্থিতির ক্রমাবনতির চিত্র পাওয়া যায়। এমন চিত্র হচ্ছে এপ্রিল ও মে মাসের যখন সমস্যা তীব্র আকার ধারণ করেনি। পরবর্তী মাসগুলোতে পরিস্থিতি আরো বিপদজনক হয়ে ওঠে। ভারতের মত একটি বৃহৎ রাষ্ট্রের অর্থনীতিতে শরণার্থী সমস্যা প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করে এবং দেশটির আর্থ সামাজিক কাঠামোতে নতুন জটিলতার সৃষ্টি হয়। ভারতীয় পত্রপত্রিকায় এসব বিষয় এসেছে আবেগ ও জাতীয় স্বার্থের মেড়কে, তবে বিদেশি পত্রপত্রিকায় এসেছে আরো ব্যাপক ও নিরপেক্ষভাবে। ব্রিটেনের বিখ্যাত সাপ্তাহিকী *The Economist* -এর ১৩ জুন ১৯৭১ সংখ্যায় যে রিপোর্ট প্রকাশিত হয় তার একাংশের অনুবাদ এখানে তুলে ধরা হল "কলেরার কারণে পাকিস্তানি শরণার্থীদের দুদর্শার প্রতি বিশ্বের জনগণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। বৃহস্পতিবারের মধ্যে কলকাতায় এতো ভ্যাকসিন ও স্যালাইন এসেছে যে, রাস্তা বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে। কিন্তু সাহায্য এতো দেরীতে এসেছে যে, ইতোমধ্যে হাজার হাজার লোক কাজ চালানো গোছের অস্থায়ী হাসপাতালের ভেজা মাটিতে ভেদবমি করতে করতে অসহায়ভাবে মৃত্যুবরণ করেছে।" [৩৮]

এর একদিন পর ১৩ জুন সংখ্যায় *Sunday Times* -এ পশ্চিমবঙ্গের বারাসাত শহর থেকে প্রেরিত মারে সালির "দুঃখের মিছিল" শীষক রিপোর্টে মৃত্যুপথযাত্রী শরণার্থীদের মর্মান্তিক চিত্র ফুটে ওঠেছে।[৩৯]

অন্যদিকে সোভিয়েত পত্রিকা *প্রাভদা*-এর ২৪ অক্টোবর সংখ্যা শরণার্থীদের মানবেতর জীবন যাপনের চিত্র ফুটে ওঠে। *প্রাভদা*-য় প্রকাশিত একটি রিপোর্টের একাংশে (অনূদিত) বলা হয়েছিল, "শরণার্থীদের আশ্রয় দেয়া হয়েছে নারিকেল পাতা ও হোগলা ছাওয়া ব্যারাকে, সাধারণ তাবুতে, নিচু কুটিরে, এমনকি চারটি খুটির ওপর ওয়েলক্লথ চাপিয়ে অনেকে আশ্রয় নিয়েছিল। ... বস্তুত এ এক নৈরাশ্যকর দৃশ্য। গৃহহীন মানুষ যদি ভারতের উদার সাহায্য না পেত তাহলে অনাহার ও মহামারীর সংখ্যা আরো অনেক বেশি হত"।[৪০] শরণার্থীদের এই অমানবিক পরিস্থিতির সাথে যুক্ত হয়েছিল কলেরা মহামারী ও মৃত্যুর মর্মান্তিক হাহাকার। ভারতের শীর্ষস্থানীয় বাংলা দৈনিক *আনন্দবাজার* জুন মাসের প্রথম দিকে জানায় যে, কলেরায় প্রায় ২০০০ শরণার্থীর মৃত্যু হয়েছে।[৪১] যদিও ভারতীয় হিসেবে কলেরায় মৃত্যুর হার অনেক কমিয়ে দেখানো হয়েছিল। কারণ ব্রিটিশ পত্রপত্রিকার রিপোর্টে দেখা যায় যে, জুন মাসে প্রতিদিন প্রায় ১০০০ শরণার্থীর মৃত্যু হয়েছে।[৪২] অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে যে, শরণার্থীদের ন্যূনতম সুযোগ-সুবিধা প্রদানও অসম্ভব হয়ে পড়েছে। ভারতীয় সূত্র থেকে শরণার্থীদের বিভিন্ন আবাসে

অবস্থানের যে চিত্র পাওয়া যায় তাতে অনুমান করা যায় যে, শরণার্থী জীবন ছিল মানবেতর।

সারণি: ৪

শরণার্থী ক্যাম্পের স্থান ও সংখ্যা

স্থান	সংখ্যা
শিবিরবাসী	২৩,০৩,৩৩৪ জন
গাছতলা	১৫,৫৯,১৪৪ জন
আত্মীয় গৃহে	২,০০,০০০ জন
মোট	৪০,৬২,৪৭৮ জন

সূত্র : *আনন্দবাজার পত্রিকা* ৫ জুন ১৯৭১।

এখানে দেখা যাচ্ছে যে, জুন মাসের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত শরণার্থীদের সংখ্যা হচ্ছে ৪০,৬২,৪৭৮ জন এবং এর মধ্যে ১৫,৫৯,১৪৪ জন গাছতলায় আশ্রয় নিয়েছেন। গাছতলাবাসীদের অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান ইত্যাদি মৌলিক চাহিদা পূরণ সম্ভব হয় নি। বিদেশী পত্রিকাগুলোতেও একই চিত্র পাওয়া গেছে।

শরণার্থী ও সামাজিক উত্তেজনা

শরণার্থী নিয়ে পশ্চিমবঙ্গে সামাজিক উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। পত্রপত্রিকায় দেখা যায় যে, স্থানীয় জনগণ ও শ্রমিকদের সাথে শরণার্থীদের সংঘর্ষ হয়। এ সংঘর্ষের প্রেক্ষিতে পুলিশের গুলিবর্ষনের ঘটনা ঘটে এবং বেশ কয়েকজন শরণার্থী প্রাণ হারান। স্থানীয় শ্রমিকদের সাথে তাদের সংঘর্ষের কারণ ছিল অর্থনৈতিক। দেখা যায় যে, শরণার্থীরা কাজ করছিল অপেক্ষাকৃত কম মজুরীতে। তারা ১ রুপী মজুরীতেই সন্তুষ্ট থাকলেও স্থানীয় শ্রমিকরা ৩ রুপীতে কাজ করতো। আবার স্থানীয় জনগণের অনেকেই শরণার্থীদের অবাঞ্ছিত উপদ্রব হিসেবে বিবেচনা করতো। নভেম্বর মাসে কৃষ্ণনগরে স্থানীয় জনগণের সাথে বেশ কয়েকস্থানে সংঘর্ষ হয় এবং পুলিশের গুলিতে কয়েকজন শরণার্থী প্রাণ হারান।[৩৩]

শরণার্থীদের পরিসংখ্যান ও বিভিন্ন প্রসঙ্গ

ভারতে শরণার্থীদের সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে। মে মাসে শরণার্থীদের একটি পরিসংখ্যান পাওয়া যায় ভারতের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী আর. কে. খাদিলকরের বক্তব্যে। তিনি জানান যে, ২১ মে শরণার্থীদের সংখ্যা ছিল ৩৪,৩৫,২৫০ জন।[৪৪] পরবর্তী মাসগুলোতে শরণার্থীদের সংখ্যা জ্যামিতিক হারে বেড়েছে। নিচের সারণিতে তার প্রমাণ পাওয়া যাবে।

সারণি : ৫

১৫ ই ডিসেম্বর পর্যন্ত ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে শরণার্থীদের সংখ্যা

ক্রমিক নং	রাজ্যের নাম	শরণার্থী ক্যাম্পের সংখ্যা	ক্যাম্পে শরণার্থী সংখ্যা	ক্যাম্পের বাইরে শরণার্থী	সর্বমোট
১	২	৩	৪	৫	৬
১	পশ্চিম বঙ্গ	৪৯২	৪৮,৪৯,৭৮৬	২৩,৮৬,১৩০	৭২,৩৫,৯১৬
২	ত্রিপুরা	২৭৬	৮,৩৪,০৯৮	৫,৪৭,৫৫১	১৩,৮১,৬৪৯
৩	মেঘালয়	১৭	৫,৯১,৫২০	৭৬,৪৬৬	৬,৬৭,৯৮৬
৪	আসাম	২৮	২.৫৫,৬৪২	৯১.৯১৩	৩৪৭,৫৫৫
৫	বিহার	৮	৩৬,৭৩২	-	৩৬,৭৩২
৬	মধ্যপ্রদেশ	৩	২,১৯,২৯৮	-	২,১৯,২৯৮
৭	উত্তর প্রদেশ	১	১০,১৬৯	-	১০,১৬৯
		৮২৫	৬৭,৯৭,২৪৫	৩১,০২,০৬০	৯৮,৯৯,৩০৫

সূত্র : *Bangladesh Documents* (New Delhi: Ministry of External Affairs, India), 1972, p. 690; *Keesings Contemporay Achievers* 1971-72, 1972, p. 24991.

ভারতে কর্মরত জাতিসংঘের বিভিন্ন এজেন্সির কর্মকর্তারা এবং বিভিন্ন আর্ন্তজাতিক স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তারা এই পরিসংখ্যানকে প্রায় সঠিক বলে মনে করতেন।[৪৫] কিন্তু পাকিস্থান সব সময়ই এ পরিসংখ্যানকে অস্বীকার করতো। ইয়াহিয়া শরণার্থীদের বলতেন, "এরা কলকাতার-ফুটপাতবাসী"। সেপ্টেম্বর মাসের শুরুতে পাকিস্থান জাতিসংঘকে জানায় যে, পূর্ব পাকিস্থান থেকে ২০,০২,৬২৩ জন শরণার্থী ভারতে চলে গেছে।[৪৬] ইয়াহিয়ার পরিসংখ্যানের কোন তথ্যগত ভিত্তি নেই। তবুও ইয়াহিয়ার বক্তব্য অনুযায়ী তার দেশের ২০ লাখ

মানুষের অন্য দেশে আশ্রয় নেয়া তার ব্যর্থতা এবং সমস্যার ভয়াবহতারই ইঙ্গিত করে।

শরণার্থীদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ হিন্দু

অপারেশন সার্চ লাইটের অব্যবহিত পরে দুটো বিষয় পরিষ্কার ছিল। প্রথমত, ভারতে শরণার্থী গমনের তীব্রতা এবং দ্বিতীয়ত, পাকিস্তানি বাহিনীর অন্ধভাবে হিন্দু নির্যাতন ও তাড়িয়ে দেয়া। প্রথম বিষয়টি উপরের পরিসংখ্যানে ওঠে এসেছে। দ্বিতীয় বিষয় অর্থাৎ হিন্দুদের উপর নির্যাতনের বিবরণ এখানে দেয়া হবে। পাকিস্তানি সামরিক জান্তা অবরুদ্ধ বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তির আশ্রয় নিয়ে নিরঙ্কুশ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা করে এবং হিন্দুদের উচ্ছেদ করার জন্যে অপারেশন চালায়।[৪৭] প্রত্যক্ষদর্শী ফাদার ডব্লিউ টিম হিন্দুদের উপর পাকিস্তানি সেনাবাহিনী এবং তাদের সহযোগী কতিপয় বাঙালি ও বিহারিদের নির্যাতনের বিবরণ দিয়েছেন। তিনি এ বিষয়ে জাতিসংঘ কর্মকর্তাদের কাছে সুনির্দিষ্ট প্রমানসহ অভিযোগ পেশ করেছিলেন। পাকিস্তানি সেনাবাহিনী অনেক ক্ষেত্রে হিন্দুদের সম্পত্তি উচ্ছেদ করে কিছু 'বিভ্রান্ত' ও 'লোভী' মুসলিমদের কাছে বিতরণ করে।[৪৮] এভাবে ব্যাপকভাবে হিন্দুদের উচ্ছেদ শুরু হয় এবং তাদেরকে ভারতে তাড়িয়ে দেয়া হয়। সারণি-৬-এ উপরোক্ত বক্তব্যের সত্যতা খুঁজে পাওয়া যাবে।

সারণি: ৬

শরনার্থীদের ধর্মীয় পরিচয়

ধর্ম	সংখ্যা
হিন্দু	৬৫.৭১ লাখ
মুসলিম	০৫.৪১ লাখ
অন্যান্য	০০.৪৫ লাখ

সূত্রঃ *Bangla Desh Documents*, p. 446; M. Ayub & K. Subramanyam, *Liberation War*, New Delhi, 1972, p.165.

প্রত্যক্ষদর্শী লেখক হুমায়ূন আহমেদের বিবরণীতেও হিন্দুদের উপর নির্যাতন এবং নির্যাতিতদের ভারতে চলে যাওয়ার কার্যকারণ খুঁজে পাওয়া যায়। হুমায়ূন পিরোজপুর জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলের একটি জনপদ 'গোয়ারেখা'-য় পাকিস্তানি

বাহিনীর নির্মম নির্যাতনের মর্মস্পর্শী বিবরণ তুলে ধরেছেন। হুমায়ূন লিখেছেন, "হিন্দুদের জন্য তখন সব পথ বন্ধ। হিন্দু জানলে দ্বিতীয় কোন কথা বলার সুযোগ নেই- সাথে সাথে গুলি। হিন্দু পরিবারগুলো বাড়িঘর ছেড়ে ছোট ছোট ছেলেমেয়ে নিয়ে আশ্রয় নিচ্ছে জঙ্গলে। বার্ষাকালের সাপ-কেচোঁ ভর্তি জঙ্গলে। দিনরাত বৃষ্টি পড়ছে, বর্ণানাতীত সব দৃশ্য। এরা পালিয়ে সীমান্ত অতিক্রম করতে পারছেনা। যেতে হবে সুন্দরবন হয়ে। নদীতে ঘুরছে মিলিটারি গানবোট।"[৬৯]

আমরা সারণি ৬-এ দেখছি যে, হিন্দুদের সংখ্যা ছিল ১২ গুনেরও বেশী। এর কারণ খুবই স্পষ্ট। পাকিস্তানি জান্তার এ সময়ে র নীতি ছিল কিছু হিন্দুদের হত্যা করে অন্যদের ভয় দেখিয়ে বসতবাড়ি থেকে উচ্ছেদ করে ভারতে ঠেলে দেয়া। এ ভাবে পূর্ববাংলার জনসংখার ২০% কে তাড়িয়ে দেয়া সম্ভব হলে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জনসংখার অনুপাত সমান হবে এবং পাকিস্তানি নেতারা এটাই আশা করেছিলেন। এটি একটি সনাতন স্ট্যাটেজি এবং বিশ্বের ইতিহাসে একটা নিকৃষ্ট সামরিক কৌশল বটে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মানিতে নাৎসী বাহিনীর ইহুদী নির্যাতন এবং সাম্প্রতিক ইতিহাসে বসনিয়ায় মুসলিম নির্যাতনে একই নীতির প্রয়োগ লক্ষণীয়।

ভারত কর্তৃক বর্হিবিশ্ব ও জাতিসংঘে শরণার্থী ইস্যু উত্থাপন

পাকিস্তান সরকারের সাম্প্রদায়িক কৌশল দেখেই ভারত মে মাস নাগাদ শরণার্থী সমস্যার সত্যিকারের স্বরুপটি বুঝতে সক্ষম হয়। প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর দূরদৃষ্টি এবং কূটনৈতিক প্রজ্ঞার কারণে ভারতের একটি মহলের একাংশে যে বিভ্রান্তি ছিল তা অপসারিত হতে থাকে। তাই দেখা যায় যে শরণার্থী সমস্যাকে দীর্ঘমেয়াদী সমস্যা বিবেচনা করে ভারত শরণার্থীদের জন্যে অসংখ্য শিবির তৈরি করে এবং তাদের খাবার ও চিকিৎসার আয়োজন করে এবং ত্রাণ সামগ্রী বন্টনও করে। অর্থাৎ ভারতে শরণার্থী সংক্রান্ত প্রশাসন এ সময় সংগঠিত রূপ নেয়। অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকেও প্রতি শিবিরে একজন লিয়াজোঁ অফিসার নিযুক্ত করা হয়।[৭০]

ভারত আর্ন্তজাতিক পর্যায়ে এবং বিশেষত জাতিসংঘে আন্তর্জাতিক বিধি ও প্রয়োজন অনুযায়ী শরণার্থী প্রসঙ্গটি উত্থাপন করেছে। অবশ্য ভারত চাইলেই সরাসরি বাংলাদেশ সমস্যা জাতিসংঘে উত্থাপন করতে পারতো না। জাতিসংঘ সনদের সীমাবদ্ধতা (আর্টিকেল ২/৭ ধারা) ও আর্ন্তজাতিক রাজনীতির নিয়ে ভারত চিন্তিত ছিল। পররাষ্ট্র মন্ত্রী সরদার শরণ সিং- এর বক্তব্যে বিষয়টি ওঠে

এসেছে। শরণ সিংহ বলেছিলেন, "It is hard reality that these UN organizations are political bodies where governments of countries are represented."[১৫১] অর্থাৎ রাজনৈতিক বিষয়ে বিভিন্ন দেশের সরকারি মনোভাবই জাতিসংঘে প্রতিফলিত হয়। ভারত বিষয়টি অনুধাবন করেছিল। তাই মানবিক বিষয় অর্থাৎ শরণার্থী প্রসঙ্গটি প্রথম জাতিসংঘে উত্থাপন করে। এ প্রসঙ্গে শরণ সিং- এর ব্যাখ্যা ছিল, "We have already raised the question of Bangla Desh in ECOSOC, and depending on the response we get, and also depending on whether it will serve our purpose and interest, we will certainly raise it in the other appropriate organization of the UN."[১৫২]

ECOSOC বা অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ হচ্ছে জাতিসংঘের এমন একটি অঙ্গসংস্থা যেখানে মানবিক ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন নিয়ে যাবতীয় কার্য সম্পন্ন হয়। ভারত বাংলাদেশ প্রশ্নে এ অঙ্গ সংস্থায়ই প্রথম গেছে। অর্থাৎ শরণার্থী সমস্যাকে ভারত 'তুরপের তাস' হিসেবে ব্যবহার করেছিল। জাতিসংঘে বাংলাদেশ প্রশ্নে ভারতের বিভিন্ন উদ্যোগ ও কর্মকাণ্ডের বিবরণী থেকেও বিষয়টি অনুধাবন করা যায়।

১২ মে ভারতের প্রতিনিধি সমর সেন জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের উপকমিটিতে পূর্ব বাংলায় জাতিগত নিপীড়ন ও গণহত্যার প্রশ্নটি উত্থাপন করেন এবং বলেন যে, জীবনের নিরাপত্তা জন্যে বাঙালিরা ভারতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছেন। তিনি বলেন, "We have set up 156 camps and have approached the Secretary General and other UN agencies such as the UNHCR, UNICEF, World Food Programme, World Health Organization. Apart from these, the Catholic Relief Organization, CARITAS, is initaining action." সমর সেন শরণার্থী সমস্যা মোকাবিলায় জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক সহায়তায় সন্তোষ প্রকাশ করেন।[৫৩]

এখানে দেখা যাচ্ছে যে, ভারত শরণার্থী সমস্যাকে খুব সতর্কতার সাথে আন্তর্জাতিক ইস্যুতে পরিণত করার উদ্যোগ গ্রহণ করছে। সমর সেনের বক্তব্যে দেখা যায় যে, জাতিসংঘের বিভিন্ন বিশেষায়িত সংস্থা এ বিষয়ে সম্পৃক্ত হচ্ছে এবং কারিতাসের মত বেসরকারি সংস্থা শরণার্থীদের ত্রাণ বিতরণ করছে। ৯ জুলাই জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের (ECOSOC) সভায় ভারতীয় পর্যবেক্ষক দলের নেতা এন কৃষ্ণণ শরণার্থী প্রসঙ্গে বলেন,

> It is clear that the task of providing food, shelter and medicines to them must receive high priority. Even the token provision of 80 million in our budget for the current year for this purpose has meant an additional tax burden of 30 percent on our people. We are therefore appreciative of the systematic response of the world community in showing this burden with us and the efforts of the UN system to channel this assistance. However, much still remain to be done to cope with the giantic relief needs of the ever increasing number of refugees.

শরণার্থী প্রশ্নে ভারত বহির্বিশ্ব ও জাতিসংঘের কাছ থেকে কী চাচ্ছে এন, কৃষ্ণণের বক্তব্যে তার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। ভারত শরণার্থীদের ভার বহনের জন্য জাতিসংঘ, আর্ন্তজাতিক সংস্থাসমূহ ও বিভিন্ন দেশকে আহ্বান জানাচ্ছে। তবে এন, কৃষ্ণণের মতে, এটা হচ্ছে সাময়িক পন্থা। শরণার্থী সমস্যার স্থায়ী সমাধানের প্রশ্নে বাঙালিদের স্বাধীনতা হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।[৫৪]

সীমান্তের দুই প্রান্তে UNHCR-এর পর্যবেক্ষক মোতায়েন প্রস্তাব: ভারতের অস্বীকৃতি

ভারত পাকিস্তানি কাঠামোতে শরণার্থীদের প্রত্যাবর্তন চায় নি। অবশ্য বাঙালি শরণার্থীরা কোনভাবেই পরাধীন মাতৃভূমিতে ফেরত যেতে ইচ্ছুক ছিল না। জাতিসংঘ মহাসচিব ১৯ জুলাই সীমিত পর্যায়ে UNHCR-এর প্রতিনিধি অর্থাৎ পর্যবেক্ষক মোতায়েনের প্রস্তাব দেন। তিনি পূর্ব পাকিস্তান সীমান্তে দুই বা তিনটি নির্বাচিত স্থানে পর্যবেক্ষক মোতায়েন করে বিষয়টি পরীক্ষা করার কথা বলেন। পাকিস্তান তাৎক্ষণিকভাবে প্রস্তাবটি গ্রহণ করলেও ভারত সরকার প্রত্যাখান করে এ যুক্তিতে যে, সে শরণার্থীদের প্রত্যাবর্তনে কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে না। প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারও এই উদ্যোগের তীব্র সমালোচনা করে।[৫৫] মূলত পর্যবেক্ষক মোতায়েনের প্রশ্নটি এসেছে পাকিস্তানের শক্তিধর মিত্র রাষ্ট্রগুলোর চাপে এবং তিনটি মূল কারণে। (ক) বাংলাদেশের চারপাশ ঘিরে রেখে মুক্তিবাহিনীর যুদ্ধাভিযান প্রতিরোধ করা, (খ) মুক্তিবাহিনীর পক্ষে ভারতীয় সহায়তার পথ বন্ধ করে দেয়া (গ) জুলাই মাসে *London Times*-এ এক নিবন্ধে, বর্ণিত সুপারিশ বাস্তবায়নের পথ বন্ধ করা। ঐ নিবন্ধে বলা হয়েছিল যে, এ সমস্যার আংশিক সমাধান হতে পারে যদি ভারত পূর্ব পাকিস্তানের একটা অংশ দখল করে শরণার্থীদের পাঠিয়ে দেয় এবং সেখানে বাংলাদেশ সরকারকে বসিয়ে দেয়া হয়।[৫৬]

ভারত মনে করেছিল স্বাধীন বাংলাদেশে শরণার্থী প্রত্যাবর্তন করবে এবং শরণার্থী সমস্যার এটিই ছিল চূড়ান্ত সমাধান। দেখা যাচ্ছে যে, ভারত দশটি পয়েন্টের ভিত্তিতে সীমান্তের দুই প্রান্তে জাতিসংঘের পর্যবেক্ষক মোতায়েনের প্রস্তাবটি নাকচ করে দেয়। ভারত স্পষ্ট করে বলেছিল, "If the international community is serious about the need for refugees to the East Bengal the first step that has to be taken is to restore condition of normalcy inside East Bengal through political settlement acceptable to the people of East Bengal and their already elected leaders."[৫৭] পর্যবেক্ষক মোতায়েনের প্রস্তাবটি আইনগত দিক থেকেও বৈধ ছিল না। কারণ সনদ অনুযায়ী এই ক্ষমতা UNHCR বা মহাসচিবের এখতিয়ারভুক্ত নয়। সনদের চতুর্থ অধ্যায় অনুযায়ী নিরাপত্তা পরিষদই শুধু এ রকম উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে।

ভারত শরণার্থী ও বাংলাদেশ প্রশ্নে সব সময় বলেছে যে, বাঙালিদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কাছে গ্রহণযোগ্য সমাধানই সে শুধু মেনে নিবে। বিষয়টি খুবই পরিষ্কার । তাজ উদ্দিনের নেতৃত্বাধীন যুদ্ধকালীন বাংলাদেশ সরকাররের শেষ কথা ছিল স্বাধীনতা।[৫৮]

আগষ্টের শুরুতেই ভারত বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিষয়টি পরোক্ষভাবে জাতিসংঘে উত্থাপন করে। ভারতের এই দৃঢ় মনোভাবের রহস্যটি ততোদিনে পরিষ্কার হয়ে যায়। কারণ এ সময় রুশ-ভারত মৈত্রী চুক্তির প্রস্তুতি সম্পন্ন হয় এবং ৯ আগস্ট তা চূড়ান্তভাবে স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তিটির নবম ধারা অনুযায়ী বহিঃ শক্তির আক্রমনের মুখে 'যৌথ পদক্ষেপ' গ্রহণের বিষয়টি যুক্ত ছিল এবং তা ভারতের যাবতীয় উদ্বেগ এবং দ্বিধাগ্রস্ত মনোভাবের অবসান ঘটায়।[৫৯]

রুশ-ভারত মৈত্রী চুক্তি স্বাক্ষরের পর ভারত প্রকাশ্যে বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রশ্নটি উত্থাপন করে। যেমন ১৮ সেপ্টেম্বর জতিসংঘে জোট নিরপেক্ষ রাষ্ট্রসমূহের অনানুষ্ঠানিক বৈঠকে ভারতের পররাষ্ট্রসচিব টি এন কল বলেন, "নিরপেক্ষ দেশগুলি যদি বাস্তব অবস্থাকে উপেক্ষা করে এবং বাংলাদেশের রাজনৈতিক সমাধানের জন্য প্রস্তাব দেয়ারও সাহস না দেখাতে পারে তা হলে সারা বিশ্বের কাছে তারা নিন্দিত হবে ও নিরপেক্ষতার মৌল ধারণাই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।" তিনি প্যালেস্টাইনের শরণার্থীদের কথা উল্লেখ করে বলেন, "নিরপেক্ষ গোষ্ঠীর একই নীতি ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলের জন্য ভিন্ন ভিন্নভাবে প্রয়োগ করা উচিত নয়।"[৬০]

তৃতীয় কমিটির বৈঠক, সাধারণ পরিষদে গৃহীত খসড়া ত্রাণ প্রস্তাব ও বাংলাদেশের অভ্যুদয়

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের মানবিক ও সাংস্কৃতিক বিষয়ক তৃতীয় কমিটি -এর সভা নভেম্বর মাসের মাঝামাঝি অনুষ্ঠিত হয়। এ বৈঠকে জাতিসংঘ শরণার্থী সংস্থার (UNHCR) প্রধান সদরুদ্দিন আগা খান তার প্রতিবেদনে বলেন,

এক. ভারতে জাতিসংঘ শরণার্থী সংস্থার (UNHCR)-এর নেতৃত্বে ইউনিসেফ (UNICEF) ,বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচী (WFP) বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) পশ্চিমবঙ্গ, আসাম ও ত্রিপুরার শরণার্থী শিবিরগুলোতে তৎপরতার সাথে কাজ করছে।

দুই. সদরুদ্দিন সরেজমিনে শরণার্থীদের মধ্যে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণের বিবরণ দেন এবং ভারতে শীর্ষস্থানীয় কর্মকর্তাদের সাথে তার বৈঠকে বিবরণ দেন।

তিন. ঢাকায় জাতিসংঘ প্রতিনিধির নেতৃত্বে ত্রাণদল কাজ করছে এর বিবরণও দেন।[৬১]

একই প্রতিবেদনে সদরুদ্দিন শরণার্থী সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় জাতিসংঘ শরণার্থী সংস্থার কাছে ভারতের দাবি যে ক্রমশ বেড়েছে তার বিবরণ দেন। সদরুদ্দিনের প্রতিবেদনের উপর আলোচনায় অংশ নেন বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধি; তাদের কেউ কেউ সমস্যার রাজনৈতিক সমাধানের কথা বলেন, আবার অনেকে শুধু মানবিক সমাধানের কথা বলেন। পাকিস্তানের মিত্র দু'একটি দেশ বিষয়টিকে অভ্যন্তরীণ সমস্যা হিসেবেও অভিহিত করেন।[৬২]

সদরুদ্দিনের প্রতিবেদনের উপর ভারত সুস্পষ্ট বক্তব্য প্রদান করে। ভারতের প্রতিনিধি রাষ্ট্রদূত সমর সেন আলোচনায় অংশ নিয়ে সমস্যার দুটো দিকের কথা বলেন। এক, শরণার্থীদের চাপ ক্রমশ বাড়ছে, দুই. এ সংকটের মূল কারণ প্রোথিত রয়েছে পূর্ব বাংলায় এবং সেখানকার নির্বাচিত প্রতিনিধি ও গ্রহণযোগ্য নেতাদের মাধ্যমে এ সংকটের সমাধান সম্ভব।[৬৩]

লক্ষণীয় যে ভারতের অবস্থান আগাগোড়া একই ছিল। তাই দেখা যায় নভেম্বর মাসে সমর সেন যে বক্তব্য দিয়েছেন তাতে প্রকারন্তরে বাংলাদেশের স্বাধীনতার কথাই এসেছে।

২২ নভেম্বর তৃতীয় কমিটিতে ভারত ও পূর্ব বাংলায় জাতিসংঘের ত্রাণ তৎপরতা অনুমোদন করে একটি খসড়া প্রস্তাব পাস হয় এবং ৬ ডিসেম্বর সাধারণ পরিষদ প্রস্তাবটি অনুমোদন করে। একই সময়ে ভারত ও পাকিস্তানে ৭০ কোটি মানুষের যুদ্ধ শুরু হয়। নিরাপত্তা পরিষদের জরুরি বৈঠকে তখন শরণার্থী প্রশ্নের চেয়ে ভারতীয় উপমহাদেশে যুদ্ধ বন্ধ এবং বাংলাদেশ সমস্যার রাজনৈতিক সমাধানের বিষয়টি প্রবল হয়ে ওঠে। ইতোমধ্যে ৬ ডিসেম্বর ভারত বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করে।[৬৪] ১৬ ডিসেম্বর ঢাকার পতনের মধ্যে দিয়ে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয় হয়। এরপর শরণার্থীদের দীর্ঘ মিছিল শুরু হয উল্টোপথে।

উপসংহার

সামগ্রিক আলোচনা ও বিশ্লেষণের প্রেক্ষিতে আমরা মোটামুটিভাবে একটি উপসংহারে পৌছতে পারি। প্রথমত, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারতের প্রত্যক্ষভাবে জড়িয়ে যাওয়ার অন্যতম প্রধান কারণ হল শরণার্থী। সে সময় ভারতের সবাই বুঝতো যে, পাকিস্তান দ্বিখণ্ডিত হলে সবচেয়ে লাভবান হবে তারাই। কিন্তু দেশটির অনেক রাজনৈতিক নেতা এবং প্রভাবশালী আমলাদের অনেকেই পূর্বভারত ও অন্যান্য বিদ্রোহপ্রবণ এলাকার নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বিগ্ন ছিলেন। তাদের যুক্তি ছিল যে, বাংলাদেশের অভ্যুদয় হলে পশ্চিমবঙ্গ বিদ্রোহ করে বাংলাদেশের সাথে যোগ দিবে এবং তামিলনাড়ু, কাশ্মীর ও পাঞ্জাবে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন মাথাছাড়া দিয়ে উঠবে।[৬৫]

প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর নিজের দলেই মতবিরোধ ছিল। বিরোধী দলগুলিতে তো ছিলই। কিন্তু প্রখর রাজনৈতিক প্রজ্ঞা আর দূরদৃষ্টির কারণে ইন্দিরা গান্ধী রাজনৈতিক সমীকরণের সঠিক হিসাব করেছিলেন। এ বিষয়ে ভারতের বর্ষীয়ান বাঙালি চিন্তাবিদ শ্রী নীরোদ চন্দ্র চৌধুরী ১৯৬৬ সালে যে মত প্রকাশ করেছিলেন তার সাথে ইন্দিরা গান্ধীর চিন্তা ভাবনার অদ্ভুত মিল লক্ষ্য করা যায়।[৬৬] বিষয়টি এরকম যে, বাঙালি মুসলমানদের স্বাধীনতা সংগ্রাম যতটা না পশ্চিম পাকিস্তান বিরোধী ও জাতীয়তাবাদী, ততটা অসাম্প্রদায়িক নয়। যে কারণে হিন্দু প্রধান পশ্চিম বাংলা নিয়ে বৃহত্তর বাংলার মরণপণ সংগ্রাম কোনভাবেই সম্ভব নয়। এ কারণে ইন্দিরা ছিলেন স্থিরচিত্ত। ফলে অবনতিশীল শরণার্থী পরিস্থিতি প্রত্যক্ষ করে এবং ভারতীয় অর্থনীতিতে অভূতপূর্ব হুমকির মুখে তিনি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিলম্ব করেন নি।

দ্বিতীয়ত, মে মাস থেকেই ভারত পরিকল্পিত ভাবে শরণার্থী পরিস্থিতিকে আর্ন্তজাতিক ইস্যুতে পরিণত করে। এ বিষয়ে ভারতের প্রধান দুটো লক্ষ্য ছিল। (ক) হস্তক্ষেপের পক্ষে আইনগত যুক্তি তৈরি করা এবং (খ) আর্ন্তজাতিক সাহায্য লাভ। ভারতের এ দুটো উদ্দেশ্য যে কম বেশি অর্জিত হয়েছিল তা বর্তমান প্রবন্ধের বিবরণী এবং সারণিগুলোতে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। বস্তুত শরণার্থী সমস্যাই বাংলাদেশ আন্দোলনকে আর্ন্তজাতিক সম্প্রদায়ের কাছে বাঁচিয়ে রাখে। মার্চ-এপ্রিলের গণহত্যা সম্পর্কে বর্হিবিশ্বের নিন্দাবাদ একটা সময় দুর্বল হয়ে যেত। কারণ চীন, মুসলিম দেশগুলো এবং যুক্তরাষ্ট্রের নিক্সন-কিসিঞ্জার জুটির সহায়তায় পাকিস্তান এই বিরাট সমস্যাকে নিজের অভ্যন্তরীণ সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করতে চেয়েছে। বাংলাদেশ সমস্যা যে সে পথে গেল না তার বড় একটা কারণ ছিল শরণার্থী। ভারতীয় এবং বিদেশী সংবাদপত্রে শরণার্থীদের যে চিত্র ফুটে ওঠে তা দেখিয়ে ভারত অত্যন্ত কুশলতার সাথে বাংলাদেশ সমস্যাকে আর্ন্তজাতিক সম্প্রদায়ের কাছে তুলে ধরতে সক্ষম হয়। কূটনৈতিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সমস্যা যত দুর্বল হতে থাকলো শরণার্থীদের অমানবিক চিত্র ততই প্রবল হলো। তখন জাতিসংঘ শরণার্থী সংস্থা (UNHCR) সহ আর্ন্তজাতিক সম্প্রদায়ের নীরব থাকার কোন পথ খোলা ছিল না। তাই দেখা যায়, পাকিস্তানের উপর শরণার্থী প্রশ্নে নানা রকম চাপ আসলো- 'শরণার্থীদের ভারত গমন বন্ধ কর', শরণার্থীদের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পরিবেশ সৃষ্টি করো' ইত্যাদি। এই চাপের মুখে ইয়াহিয়া দু'বার 'সাধারণ ক্ষমা' ঘোষণা করলেও তা ছিল লোক দেখানো। অন্যদিকে প্রাণভয়ে ভারতে আশ্রয় নেয়া শরণার্থীরা কোন অবস্থাতেই পাকিস্তানের রাষ্ট্র কাঠামোর ভেতর প্রত্যাবর্তন করতে রাজি ছিলেন না। ফলে শরণার্থী প্রশ্নে বাংলাদেশে ভারতের হস্তক্ষেপের পথ উন্মুক্ত হয়ে যায়।

প্রথম থেকেই ভারতের উদ্দেশ্য ছিল খুবই পরিষ্কার। মার্কিন গবেষকদ্বয় Richard Sission ও Leo Rose -এর ভাষ্যের সাথে বর্তমান প্রবন্ধে উল্লেখিত জেনারেল অরোরার বক্তব্য পুরোপুরি মিলে যায়। গবেষকদ্বয় ভারতীয় উৎস ও কর্মকর্তাদের সাক্ষাৎকার বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে, "New Delhi had decided by early April to attempt to concentrate the refugee in camps close to East Pakistan border rather than, as in past, allowing to move into India as citizens of India."[৬৭] এভাবেই শরণার্থী সমস্যাকে ভারত 'তুরুপের তাস' হিসেবে ব্যবহার করে।

তৃতীয়ত, ভারত জাতিসংঘে প্রথম গণহত্যা ও শরণার্থী প্রশ্নই উত্থাপন করেছে। অবশ্য জাতিসংঘে সনদের আর্টিকেল ২/৭ অনুযায়ী ভারত সরাসরি বাংলাদেশ সমস্যার রাজনৈতিক সমাধানে বিষয়টি উত্থাপন করতে পারতো না। তাই জাতিসংঘের অর্থনৈতিক সামাজিক পরিষদ (ECOSOC), বিশেষায়িত সংস্থা যেমন- জাতিসংঘ শরণার্থী সংস্থা (UNHCR), ইউনিসেফ (UNICEF), বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচী (WFP), বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) ইত্যাদি বরাবরে আবেদন করেছে। ভারত এটা কখনো মাহসচিব বরাবরে করেছে আবার কখনো জাতিসংঘের সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোর কাছে উত্থাপন করেছে। ফলে বাংলাদেশ প্রশ্ন শুধু শরণার্থী বিষয়ে সীমিত থাকে নি পাশাপাশি রাজনৈতিক সমাধানের কথাও এসেছে। ভারত শেষ পর্যন্ত স্থায়ী সমাধান প্রশ্নে বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিষয়টি স্পষ্ট করে বলেছে।

ভারত জাতিসংঘের বিভিন্ন এজেন্সী, বিভিন্ন দেশ ও আর্ন্তজাতিক স্বেচ্ছাসেবী সংস্তাগুলোর কাছ থেকে বিপুল সাহায্যও পেয়েছে। যদিও প্রয়োজনের নিরিখে তা পর্যাপ্ত ছিল না। বর্তমান প্রবন্ধে তার একটি হিসাব দেয়া হয়েছে। কাজেই শরণার্থীদের পেছনে ভারত নিজস্ব তহবিল থেকে বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করেছে। এ বিষয়টি এখন প্রমাণিত। বাংলাদেশের মুক্তিবাহিনীর প্রধান সেনাপতি জেনারেল আতাউল গণি ওসমানীর মন্তব্য এখানে প্রনিধানযোগ্য। ওসমানীর ভাষ্য হলো যে, "ভারতবর্ষের জনগণ ও সরকারের কাছে আমরা চির কৃতজ্ঞ। ভারতের জনগণ ও সরকার আমাদের নিরন্ন-নিরাশ্রয় জনগণকে আহার দিয়েছেন এবং আমাদের মুক্তিসংগ্রামের গোড়ার দিকে আমরা ভারতীয় সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর কাছ থেকে এবং পরে ভারতীয় বাহিনীর কাছে থেকে সর্বাত্মক সাহায্য ও সহযোগিতা পেয়েছি"।[৮৮]

ওসমানীর সাথে দ্বিমতের কোন যুক্তি নেই। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারত সরকার ও জনগণের সহযোগিতা স্বাধীনতার জন্যে বাঙালিদের অদম্য আকাঙ্খাকেই ১৯৭১ কালপর্বে বাস্তব রূপ দিয়েছিল।

তথ্য নির্দেশ

১. মে মাসে শরণার্থীদের সংখ্যা ছিল ৩৪,৩৫,২৫৩ জন। দেখুন *Bangla Desh Documents* (New Delhi: Ministry of External Affairs, Government of India, 1972), p. 672. এছাড়াও দেখুন *Keesings Contemporary Archives*, 3-10 July 1971-1972, p.24685. ডিসেম্বর মাসে শরণার্থীদের সংখ্যা

সম্পর্কে দেখুন *Keesings Contemporay Archieves*, December 18-25, 1971, p. 24940.

২. গোলাম মুরশিদ, "মুক্তিসংগ্রামে শরণার্থীদের ভূমিকা", দ্রষ্টব্য তাজুল মোহাম্মদ সম্পাদিত, *একাত্তরের স্মৃতিগুচ্ছ* (ঢাকা: সাহিত্য প্রকাশ ১৯৯৮), পৃঃ ১৮৩।

৩. *Encyclopedia of Britanica* (Chicago, USA: 1981), pp. 568-72; শরণার্থীদের সাম্প্রতিক সংজ্ঞার জন্য দেখুন, *UDBASTU*, (Dhaka: ISSUE 3, December 1997), pp.2-3.

৪. *Proceedings of Lok Sabha*, 27 March 1971 (New Delhi: Lok Sabha Secretariat, 5th Series, Vol.1), pp.42-43.

৫. Inder Malhotra, *Indira Gandhi, A Personal and Political Biography* (London: Hodder & Stoughton, 1989), p. 133.

৬. *Hindustan Times*, (New Delhi), 1 April 1971.

৭. শাহরিয়ার কবির, "বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও ভারত", দ্রঃ প্রফেসর সালাহউদ্দীন আহমদ (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাস* (ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৭), পৃঃ ২৯১।

৮. ফজলুল বারী লিখেছেন, 'ভারত সরকার তখনও বলেছিল, উদ্বাস্তুদের বাঁচাতে তারা মানবিক আবেদনে সাড়া দিয়েছে'। দেখুন, ফজলুল বারী, *একাত্তরের কলকাতা* (ঢাকা: ১৯৯৭), পৃঃ ২২।

৯. *দৈনিক যুগান্তর* (কলকাতা), ২ এপ্রিল ১৯৭১।

১০. *দৈনিক আনন্দবাজার* (কলকাতা), ২৩ এপ্রিল ১৯৭১।

১১. *যুগান্তর*, ২৩ এপ্রিল ১৯৭১।

১২. *আনন্দবাজার*, ৮ মে ১৯৭১।

১৩. ৫ টি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীগণ হলেন, আসামের শ্রী মহেন্দ্র মোহন চৌধুরী, ত্রিপুরার শ্রী শচীন্দ্র লাল সিংহ, বিহারের শ্রী কর্পূরী ঠাকুর, মেঘালয়ের শ্রী উলিয়ামসন সংমা এবং পশ্চিমবঙ্গের শ্রী অজয় মুখোপধ্যায়। পাঁচ মুখ্যমন্ত্রীর বৈঠকে বলা হয় যে, "এমন অবস্থার সৃষ্টি করতে হবে যাতে এই শরণার্থীরা আবার বাংলাদেশে ফিরে যেতে পারে এবং সেজন্যে সকলকে অবিলম্বে উদ্যোগী হতে হবে। দেখুন *আনন্দবাজার*, ৯ মে ১৯৭১।

১৪. *The Statesman*, 17 May 1971.

১৫. *The Statesman*, 19 May 1971.

১৬. *The Hindustan Standard*, 21 May 1971.

১৭. Surjit Mansingh, *India Search for Power*, (New Delhi: Sage Publication, 1984), p. 88.

১৮. ১৯৭১-৭২ সালে শরণার্থী খাতে ভারত সম্ভাব্য ব্যয়ের হিসাব করে বলেছিল, ৫৫ কোটি ৮০ লক্ষ ডলার খরচ হবে। দেখুন *Bangla Desh Documents*, *Ibid.*, Vol.II, p. 931; অক্টোবর ১৯৭১ পর্যন্ত ভারত শরণার্থী খাতে ৪০ কোটি ডলার ব্যয় হয়েছিল বলে প্রচার করে। দেখুন S.S. Shahi, *Defenders of India, Victory of Peace and Liberty* (New Delhi: 1972), p. 55. ১৯৭১ সাল ও পরবর্তী বছরগুলোতে ভারতীয় জনগণকে রেভিনিউ স্ট্যাম্প, খবরের কাগজ, সিনেমার টিকিট ইত্যাদি খাতে সারচার্জ দিতে হয়েছে। দেখুন *বাংলা নামে দেশ* (কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, ২য় সংস্করণ, ১৯৯০), পৃঃ ৬১।

১৯. লোকসভা নির্বাচনে ইন্দিরা গান্ধীর পরাজয়ের কারণ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্যের জন্যে দেখুন Inder Malhotra, *op. cit.*, p.143.

২০. প্রবন্ধকারের সাথে লেঃ জেনারেল অরোরার সাক্ষাৎকার, ঢাকা, মার্চ ১৯৯৮। এছাড়াও দেখুন J.F.R. Jacob, *Surrender at Dacca* (Dhaka: UPL, 1st Edition, 1997), p.60.

২১. *India and Bangla Desh: Indira Gandhi, Selected Speaches and Statement (March to December, 1971* (New Delhi: Orient Longman, 1972), p.31.

২২. *Newsweek*, 6 December, 1971.

২৩. *The Financial Times* (UK), 6 Decenber, 1971.

২৪. জেনারেল অরোরার সাক্ষাৎকার, মার্চ ১৯৯৮। আরো দেখুন *The Daily Star* (Dhaka), 23 March, 1998.

২৫. পূর্ব বাংলায় ভারতের হস্তক্ষেপের স্বপক্ষে আন্তর্জাতিক আইনের বিভিন্ন যুক্তি ও উদাহরণ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে দেখুন S.K. Mukherjee, *Bangla Desh and International Law* (Calcutta: 1971), pp. 21-27.

২৬. *দৈনিক আনন্দবাজার*, ৬ মে, ১৯৭১।

২৭. শ্রী সমরগুহের প্রস্তাব ও কংগ্রেসের বিরোধিতা সম্পর্কে দেখুন, *Proceedings of Lok Sabha*, পূর্বোক্ত।

২৮. *The Statesman*, 17 May 1971.

২৯. *The Amrita Bazar Patrika*, 7 May 1971.

৩০. M. Ayob & K. Surahmanyam, *Liberation War* (New Delhi: 1972), p. 170.

৩১. *The Observer* (UK), 13 June 1971.

৩২. *Proceedings of Lok Sabha, Ibid.*, pp. 114-15. এছাড়াও দেখুন *India and Bangla Desh, op. cit.*, pp. 13-14.

৩৩. হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিলপত্র,* দ্বাদশ খন্ড (ঢাকা: তথ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সরকার, ১৯৮২), পৃ : ২২৭।

৩৪. *যুগান্তর*, ৩ এপ্রিল ১৯৭১।

৩৫. *The Hindustan Standard*, 12 April 1971.

৩৬. একটি ভারতীয় পত্রিকা লিখেছিল, "900 refugees killed on way to India." দেখুন *Amrita Bazar Patrika*, 30 Arpil 1971.

৩৭. *যুগান্তর,* ৯ মে ১৯৭১।

৩৮. *The Econonist* (UK), 12 June 1971.

৩৯. *Sunday Times* (UK), 13 June 1971.

৪০. *প্রাভদা* (সোভিয়েত ইউনিয়ন), ২৪ অক্টোবর ১৯৭১।

৪১. *আনন্দবাজার,* ৫ জুন ১৯৭১। এছাড়াও দেখুন *Mainichi Daily News* (Japan). পত্রিকাটি ৬ জুন ১৯৭১ সংখ্যা লিখেছে, কলেরায় মৃত্যুর সংখ্যা হল ২৭০০।

৪২. *Sunday Times* (UK), 3 June 1971. ঐদিন পত্রিকাটি লিখেছিল, "সারা বাংলায় কলেরায় মৃত্যুর সংখ্যা ছিল ৯০০। বুধবার তা বেড়ে দাঁড়ায় ১৩০০।"

৪৩. *Sunday Times* (UK), 3 June 1971. এছাড়াও দেখুন রবীন্দ্রনাথ ত্রিবেদী, *একাত্তরের দশ মাস* (ঢাকা: ১৯৯৭), পৃ: ৫০৭।

৪৪. *Bangla Desh Documents*, op. cit., p. 672. আরো দেখুন *Keesings Contemporary Archives*, 3-10 July 1971, p. 24685.

৪৫. ১৯৭১ সালে ভারত ও পাকিস্তানে USAID এর উপ-প্রধান ছিলেন Mr. Manrice William. তিনি ভারত ও পাকিস্তানে যুক্তরাষ্ট্রের ত্রাণ সাহায্য তদারকি করেন। তিনি অক্টোবরে ওয়াশিংটনে প্রশাসনকে জানান যে, শরণার্থী প্রশ্নে ভারতের দেয়া পরিসংখ্যান প্রায় সঠিক। দেখুন US Department of State, *Situation Report*, 27 October 1971.

৪৬. *The Dawn* (Karachi), 2 September 1971.

৪৭. M. Ayoob & K Subrahmanyam, *op. cit.*, p. 165.

৪৮. ফাদার ডব্লিউ টিমের সাক্ষাৎকার। এছাড়াও দেখুন F.W. Timm, *Forty Years in Bangladesh* (Dhaka: Caritas, 1995), pp. 165-180.

৪৯. হুমায়ুন আহমেদ, *অনন্ত অম্বরে* (ঢাকা: কারেন্ট বুকস, ১৯৯২), পৃ: ৬৫-৬৬।

৫০. লেখকের সাথে এম. এ. মুহিতের সাক্ষাৎকার, সেপ্টেম্বর ১৯৯৬।

৫১. *Bangla Desh Documents*, p. 707.

৫২. শরণ সিং লোকসভার বাজেট অধিবেশনে বক্তৃতাকালে ভারত কর্তৃক জাতিসংঘে বাংলাদেশ প্রসঙ্গ কীভাবে উত্থাপন করছে তার বিস্তারিত বিবরণ দেন। দেখুন *Bangla Desh Documents*, p. 707.

৫৩. হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পাদিত), *পূর্বোক্ত*, ১২ খন্ড, পৃ : ১৮।

৫৪. ঐ পৃ : ৫৭।

৫৫. *Hindustan Times*, 24 July 1971. আরো দেখুন *জয়বাংলা* (মুজিবনগর) , ৩০ জুলাই ১৯৭১।

৫৬. Pater Hazelhurst, *The Times* (UK), 13 July 1971.

৫৭. *Bangla Desh Documents*, p. 321.

৫৮. *জয়বাংলা*, ২৭ আগস্ট ১৯৭১ লিখে, "বাংলাদেশের জনগণের ইচ্ছাই রাজনৈতিক সমাধানের ভিত্তি।" আরো দেখুন *জয়বাংলা* , ৮ অক্টোবর ১৯৭১। ঐ সংখ্যায় স্পষ্ট করে বলা হয়, "পূর্ণ স্বাধীনতা ছাড়া কোন প্রস্তাব গ্রহণযোগ্য নয়।"

৫৯. *India and Bangla Desh* : *op. cit.*, p. 40.

৬০. হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পাদিত), *পূর্বোক্ত*, ১২ খন্ড পৃ : ৭৭।

৬১. তৃতীয় কমিটিতে সদরুদ্দিনের প্রতিবেদনের উপর বিস্তারিত বিবরণের জন্যে দেখুন *জাতিসংঘ দলিলপত্র*, উদ্ধৃত হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পাদিত), *পূর্বোক্ত*, ১৩ খণ্ড, পৃ : ৭৮২-৮৭।

৬২. সোভিয়েত ও ফ্রান্সের প্রতিনিধিদের বক্তব্যে মানবিক ও রাজনৈতিক সামাধানের বিষয়টি প্রাধান্য পায়। দেখুন হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পাদিত), পূর্বোক্ত, ১৩ খণ্ড পৃ: ৭৯৫-৯৬। অন্যদিকে পাকিস্তানের ঘনিষ্ঠ মিত্র নাইজেরিয়া সে সময় বিচ্ছিন্নতাবাদী সমস্যায় আক্রান্ত ছিল। তাই নাইজেরিয়া কোন ভনিতা না করে বাংলাদেশ সমস্যাকে পাকিস্তানের "অভ্যন্তরীণ বিষয়" বলে অভিহিত করে। দেখুন, হাসান হাফিজুর রহমান, *পূর্বোক্ত*, ১৩ খন্ড, পৃ: ৮০০।

৬৩. সমর সেনের পূর্ণাঙ্গ বক্তব্যের জন্যে দেখুন *জাতিসংঘের দলিলপত্র*, ১৮ নভেম্বর ১৯৭১, উদ্ধৃত হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পাদিত), *পূর্বোক্ত* , ১৩ খণ্ড পৃ: ৭৮৮-৯৪।

৬৪. *India and Bangla Desh*: *op. cit.*, p.132.

৬৫. M.A. Ayob & K. Subrahmanyam, *op. cit.*, p. 169.

৬৬. শ্রী নীরদ চন্দ্র চৌধুরী, *নির্বাচিত প্রবন্ধ* (কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স ১৯৯৭), পৃ: ৮৫-৮৯।

৬৭. Richard Sission & Leo Rose, *War and Secession: Pakistan, India and Creation of Bangladesh* (New Delhi: Vistaar Publication, 1990), p. 146. আরো দেখা যায় যে, ভারত সরকারের সঠিক পরিকল্পনা ও সাফল্যের বিষয়টি পরাজিত পাকিস্তানি জেনারেল এ. এ. কে খান নিয়াজীও স্বীকার করেছেন। তার ভাষায়, "The Indian Government does not throw in its troops hapazarldy without proper planning, and never resorts to open hostilities unless they are one hundred per cent sure of success." See Lt. Gen. A.A. Khan Niazi, *The Betrayal of East Pakistan* (Karachi: Oxford University Press, 1998), p.55.

৬৮. ওসমানীর বক্তব্যের জন্যে দেখুন *বাংলার বাণী* (ঢাকা), ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭২।